চতুর্ভুজ চতুরানন

চতুরানন ওরফে চতুরার যখন আমাদের সংসারে আবির্ভাব হ'ল তখন আমি সবে কলেজে ঢুকেছি। পাটনায় হস্টেলে থাকি, সপ্তাহান্তে বাড়ি আসি। এ ছাড়া লম্বা ছুটি-ছাটা তো আছেই। চতুরার বয়স তখন আট থেকে বারোর মধ্যে। এই এতটুকু গিরগিট্টে চেহারা, দুই চোখ দিয়ে দুষ্টুমি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

চতুরার বাবা গোবর্ধন আমার বাবার প্রাক্তন রুগী। কোন হাতুড়ের কেরদানিতে চোখ দু'টো যায় যায়, তখন ওর গাঁয়ের কেউ হাত ধরে বাবার চেম্বারে পৌঁছে দিয়ে গেছিল। দীর্ঘ দিনের চিকিৎসায় আবার যখন দৃষ্টি ফিরে পেলো গোবর্ধন বাবার আনন্দ দেখে কে! বাবা গোবর্ধনকে এক চলমান ট্রফি, নিজের কৃতিত্বের বিরাট এক জলজ্যান্ত প্রমাণ বলে মনে করতেন। গোবর্ধনও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে রইলো চিরদিন।

এর বছর তিরিশ পরে ওর ছেলেরা জোর করে বুড়ো বাপকে নিজেদের কাছে নিয়ে গেল ভিন দেশে। যাবার আগে বাবার রোগশয্যার পাশে বসে কেঁদেছিল গোবর্ধন। বলেছিল, "ডাগ্ডর সাব, এত বছর তুমিই বাঁচিয়ে রেখেছিলে। এখান থেকে চলে গিয়ে আর বেশীদিন বাঁচবো না।" সত্যিই এক বছরের মধ্যেই মারা গেল গোবর্ধন। আমার বাবা গেলেন তার বছর দুয়েক পরে। এসব অনেক পরের কথা।

চোখের চিকিৎসার জন্যে গোবর্ধন দিন পনেরো অন্তর শহরে আসতো, বাবার কাছে ওষুধপত্তর নিতে। প্রথম দিকে সঙ্গে কেউ না কেউ থাকতো। কিছুদিন পরে নিজেই রাস্তা ঠাওর করে একা একা চলে আসতো। তারপর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পরও নিয়মিত বাবার সঙ্গে

দেখা করতে আসতো। ততদিনে ওর নিজের খেত খামারের কাজকর্ম আবার শুরু করেছে। নিজের কাজেও শহরে আসতে হত। আর প্রতিবারই আমাদের বাড়ি আসতো। বাবার চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো। কখনো বা নিজের খেতের ফলমূল আনতো, যেচে কাজ করে দিয়ে যেতো ---- বাজারঘাট, গম ভাঙানো, এই সব। দুপুরে চেম্বার বন্ধ হবার পর বাবা গোবর্ধনের সঙ্গে এটা ওটা আলোচনা করতেন। বাবার কাছে অনেকেই নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলতো। বোধহয় ডাক্তারদের অনেকেরই এই স্বভাব ---- অন্যদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। পেশার গণ্ডির বাইরেও।

গোবর্ধনের সংসারে দু'টি ছেলে ও দু'টি মেয়ে। স্ত্রী মারা গেছে বছর কয়েক আগে। মেয়ে দু'টির অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে যেমন বিহারের গ্রাম্য সমাজে রেওয়াজ। বড় ছেলেটি সাদামাটা শান্ত। ছোটটি একটু বুনো টাইপের। বোধহয় সেই বন্য ছেলেকে বাগে আনার জন্যেই আমাদের হেফাজতে পাঠিয়েছিল তাকে।

ছুটিতে বাড়ি এলেই চতুরার কীর্তিকলাপ নজরে পড়তো। গোবর্ধন অনেক করে বলে দিয়েছিল চতুরাকে দিয়ে যেন কাজ করানো হয়। কিন্তু চতুরা কাজ করবে কি চতুরাকে সামলানোই একটা কাজ। এক দণ্ড স্থির থাকে না, সব সময় তিড়িং বিড়িং করে বেড়াচ্ছে আর সর্বদাই এটা ওটা ফেলা ছেঁড়া ধাক্কালাগা লেগেই আছে। মা বলতেন ওর গায়ে বোধহয় জলবিছুটি লাগানো তাই অমন তিড়িং বিড়িং করে। আবার ওর সামনে এসব বলা চলবে না। তক্ষুণি রাগ করে দড়াম করে মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকবে। অবশ্য এসব মান অভিমান শুধু আমার মার সঙ্গেই করতো। আমরা বলতাম মা ওকে মাথায় তুলেছে। রোজ রাত্রে মা ওকে অনেকক্ষণ ধরে সাধাসাধি করে খাওয়াতেন। ও উপুর হয়ে শুয়ে থাকতো। বলতো, "ভুখ্ নৈখে।"

আমাদের বাড়ি সবসুদ্ধু বছর দুয়েক বোধহয় ছিল। ইতিমধ্যে গোবর্ধনের বড় ছেলে চন্দ্রানন অর্থাৎ চন্দুর বিয়ে হয়ে গেল। এতদিনে ছেলের বউ এসে অন্তত রান্নার হাত থেকে শ্বশুরকে রেহাই দেবে এটাই ভেবেছিল সবাই কিন্তু তার বদলে চন্দুই 'সসুরাল' চলে গেল। চন্দুর শ্বশুর নাকি অবস্থাবান লোক, সবজির ব্যবসা করে। দু'টি মেয়ে শুধু,

ছেলে নেই। জামাইকে ব্যবসায় লাগাবে। চন্দু চলে যাবার পরে পরেই চতুরাকে আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে গেল গোবর্ধন। বাড়িতে একা আর পেরে উঠছিল না। এক ফালি জমি আছে। জমির কাজ, ঘর গেরস্তালি। আমার মা বলতেন, দ্যাখ্ দিকি লোকটা কত ভাল। আট বছর আগে বউ মরে গেছে। কত কষ্ট করে ঘর সংসার দেখা ছেলে মেয়ে মানুষ করা সব কিছু একা হাতে সামলেছে। আর বাবুরা সব ফট্ করে বিয়ে করে বসে।

এর বছর দুয়েক পর শুনলাম চতুরার বিয়ে হয়েছে। একগলা ঘোমটা টেনে নতুন বউ শ্বশুরের সঙ্গে এসে দেখা করে গেল। মা ওর আঁচলে টাকা আর সিধে বেঁধে দিলেন ওখানকার রেওয়াজ মত। মা বললেন চতুরা নাকি এখন দেখতে দিব্যি লম্বা চওড়া সুপুরুষ। বললেন চতুরার বয়স আমরা আট থেকে বারো ভাবতাম, তখন আসলে ও পনেরোর এক চুলও কম ছিল না। তা না হলে এই কবছরে এমন গোঁফ টোফ সুদ্ধু বিশাল বড়মানুষ হতে পারতো না। তাজ্জব ব্যাপার !

গোবর্ধন নিয়ম করে প্রতিমাসে দু'বার অন্তত শহরে আসতো। বাবার সঙ্গে দেখা করে বাড়ির কিছু কিছু কাজকর্ম করে দিয়ে যেতো। গরম কালে মাথায় করে ঝাঁকা বোঝাই আম কিনে আনতো। সবজি আনাজ কিনে দিয়ে যেতো। তখনকার যুগে ছোট সংসারেও ফল সবজি ঝুড়ি বোঝাই আসতো। অতিথি - অভ্যাগত - সারা দিনের কাজের লোক - ঠিকে ঝি চাকর সবারই খাবার দাবার ব্যবস্থা থাকতো বাড়িতে। বোধহয় শস্তাগণ্ডার দিন ছিল বলেই এমনটা হত। কিংবা হয়তো মানুষের মূল্যবোধের মাপকাঠি অন্যরকম ছিল আজকের তুলনায়।

আমি পড়াশুনা শেষ করে শিলঙে চাকরি করি তখন। শীতের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। এর আগে পাটনা থেকে গরমের লম্বা ছুটিতে এসেছিলাম যখন তখন শুনেছিলাম চতুরাকে চন্দু নিয়ে গেছে সবজির কারবারে যোগ দিতে। চন্দুর শ্বশুর মারা যেতে চন্দুকে একা সামলাতে হচ্ছে সব। চতুরাকে পেলে সবদিকে সুরাহা হয় তার। চতুরা তার বউ লীলাবতীকে রেখে গেছে বাপের কাছে। ওকে ফি হপ্তায় ট্রাক বোঝাই সবজি নিয়ে আরা শহরে আসতে হয়, ফিরতি পথে বাড়ি হয়ে বাপ আর বউকে দেখে যায়। চন্দুর শ্বশুরালয় সাসারাম পার হয়ে। গোবর্ধনের গাঁ

থেকে অনেকটা দূর। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার থাকা কালে গোবর্ধন লীলাবতীকে নিয়ে বার তিন চার এসেছিল। লীলাবতী ভিতর বারান্দায় এসে বসেছিল। ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করলো মাকে ও আমাকে। এখনও সেই এক গলা ঘোমটা। চতুরাকেও দেখলাম একবার। একেবারে চেনা যায় না। কি লম্বা স্মার্ট চেহারা ! মা বললেন সবজির ব্যবসায় নেমে স্মার্ট হয়েছে। পোষাক আশাক সব পালটে গেছে। বাহারে বুশশার্ট প্যাণ্ট, হাতে হাতঘড়ি চোখে কালো চশমা।

এটা হল গরম কালের কথা। এরপর শীতের ছুটিতে গিয়ে মনে হল আবহাওয়া কেমন জটিল মত। লীলাবতী বারান্দায় বসে ঘোমটার মধ্যে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে ঘন ঘন। গোবর্ধন বাবাকে নীচু গলায় কি সব বলে চলেছে এক টানা। মা জোর করে লীলাবতীকে ঝোলভাত খাওয়ালেন। ওরা চলে যেতে মা বললেন লীলাবতী নাকি অন্নজল ত্যাগ করেছে। বুড়ো শ্বশুর হাজার বলে কয়েও খাওয়াতে পারেনি দুদিন যাবৎ।

"সেকি, হঠাৎ !"

মা উদাস মুখে বললেন, "কপাল আর কি। শুধু লীলাবতী নয়, গোবর্ধনের ঝকমারিটাই কি কম? ছোঁড়াটা হাড়বজ্জাত, সেই কোন বয়স থেকে। বাড়িসুদ্ধু সবার হাড় ভাজাভাজা করে খেলো।"

ক্রমে ক্রমে পুরো কাহিনী প্রকাশ পেলো। দাদার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চতুরা যে শুধু সবজির ব্যবসাতেই হাত পাকিয়েছে তা নয়, আরও অন্য ব্যাপারেও লিপ্ত করেছে নিজেকে। চন্দুর বড় শালী শনিচরি বিয়ের পরে পরেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে পড়েছিল এযাবৎ। চন্দুর বউ মুনিয়া শান্ত ভালমানুষ মতো, দিদিটা তার ঠিক উলটো।

"আমাদের চতুরার মতো?" আমি মুখ ফসকে বলে ফেলি।

"চতুরার কান কাটে। ছোঁড়াটারও কি আক্কেল বল দিকি? ফি হপ্তা বাড়ি আসে, যেন ভাজা মাছটি উল্টোতে জানে না। এদিকে ভিতরে ভিতরে কি কেলেঙ্কারিটা করে বসেছে ! একটা বিয়ে করা বউ বাড়িতে থাকতে ওই কুচক্রীটার ফাঁদে পা দিলি কি বলে?"

"তাই লীলাবতী অমন করে কাঁদছিল?"

"না কেঁদে করবে কি? লীলাবতীর তিন ভাই ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছে

চতুরাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। ওদের বোনকে হেনস্থা করার চরম শোধ নেবে।"

এরপর কিছুদিন আর গোবর্ধনের কোনও খবর নেই। গোটা একমাস ধরে এলোই না মোটে। এরকম কখনো হয় না। বাবা খুব চিন্তিত হয়ে লোক পাঠালেন। লোকের মুখে ভাসা ভাসা যা সংবাদ এলো খুব একটা আশাপ্রদ নয়। লীলাবতীর ভাইয়েরা নাকি দলবল নিয়ে হন্যে হয়ে চতুরাকে চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাতে পেলেই দফা নিকেশ করবে। তবে এখনও নাগালে পায়নি তাকে। ছোঁড়াটা একেবারে কর্পূরের মত হাওয়া হয়ে গেছে কোনরকম হদিশ নির্দেশ না রেখে।

ছুটি শেষ হল। কাহিনীকে অর্ধপথে ঝুলিয়ে রেখে আমি শিলঙে পাড়ি দিলাম। শিলঙে গিয়েও মাঝে মাঝে মনে পড়তো। কাহিনীর গতিপথ কোন দিকে ঘুরবে আন্দাজ করার চেষ্টা করতাম। লীলাবতীর ভাইয়েরা যদি তার অপমানের শোধ নিতে সক্ষম হয় তবে তাতে লীলাবতীর ভাল হবে কি খারাপ হবে, অপমানের জ্বালা ও স্বামীকে হারানোর শোক (তা সে খল-কপট স্বামী হলেও) ---- এই দুয়ের মধ্যে কোন দিকটার পাল্লা ভারী হবে লীলাবতীর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, মনে মনে হিসেব করার চেষ্টা করতাম। অবশ্য এসব ভাবনা চিন্তা ক্বচিৎ কদাচিৎই মাথায় আসতো। শিলঙে নিজের কাজকর্ম ও নিজস্ব মাথা ব্যাথা গুলোর চাহিদা মিটিয়ে ফালতু সময় কমই মিলতো। তবু, অসমাপ্ত ডিটেকটিভ গল্পের মত একটা মৃদু অসন্তোষ, একটা চাপা কৌতুহল মাঝে মাঝে মনের মধ্যে নড়া চড়া করতো।

এরপর বাড়ি এলাম আবার সেই পুজোর ছুটিতে। প্রায় আটমাস পরে। এতদিন পরে বাড়ি ফেরার আনন্দে গা ভাসিয়ে ভুলেই গেছিলাম গোবর্ধনের পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা। একদিন সকালে খোদ গোবর্ধন এসে হাজির। একেবারে ভিতর বাড়ির উঠোনে। মুখভরা হাসি আর থালাভরা মিঠাইমণ্ডার সমারোহ নিয়ে। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি। আমার মা তরতর করে এগিয়ে গিয়ে একগাল হেসে প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে গোবর্ধন, নাতি না নাতনি?" বাবা চেম্বারে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন, গোবর্ধনের সাড়া পেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

গোবর্ধন গদগদ কণ্ঠে বললো, "বহুকে বেটি ভইল মাঈজী।"

বাবা উদাত্ত প্রসন্ন গলায় বললেন, "সে তো খুব আনন্দের কথা গোবর্ধন। নাতি আর নাতনি দুই-ই পেয়ে গেলে, আর কি চাই !"

আরও খানিক কথাবার্তার পর গোবর্ধন চলে গেল। বাবাও ভিতরের দরজা দিয়ে চেম্বারে গেলেন।

গোবর্ধনের কথাবার্তা শুনে আমার কেমন খটকা লাগলো।

মাকে চেপে ধরলাম, "কি ব্যাপার আমাকে বলো। একেবারে শুরু থেকে বুঝিয়ে বলো।"

মা বললেন, "এতে আবার বোঝাবুঝির কি আছে। তুই তো সব কথা জানিস। লীলাবতীর একটা মেয়ে হয়েছে। ছট্ঠির মিষ্টি দিয়ে গেল তাই।"

"লীলাবতীর মেয়ে মানে? চতুরাকে মারার জন্যে তো চারিদিকে লোক ঘুরছিল। চতুরাকে মারেনি ওরা?"

"চতুরার পাত্তা পেলে তো ! এমন ডুব দিলো যে কাকপক্ষীটিও ওর টিকি দেখতে পেলো না।"

"কোথায় লুকিয়েছিল?"

"কোথায় আবার! নিজের বাড়িতে, বউ লীলাবতীর হেফাজতে। এমন ঘাপটি মেরে থাকতো যে গোবর্ধনও গোড়ার দিকে টের পায়নি যে ছেলে তার ওই এক রত্তি ভিটের মধ্যেই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তারপর লীলাবতী সন্তানসম্ভবা হতে চতুরা আত্মপ্রকাশ করে বাপকে খুলে বললো সব। তখন গোবর্ধন ছুটলো গ্রামের মাতব্বরদের কাছে। তারা আবার লীলাবতীর ভাইয়েদের খবর পাঠালো। সমাচার শুনে ভাইয়েরা তো ভয়ে কাঠ।"

"কেন? কেন?"

"ওমা ভয় পাবে না? চতুরা যদি সম্বন্ধ অস্বীকার করে তাহলে গাঁয়ের লোকেরা তাদের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দেবে না? গলায় দড়ি দেবারও মুখ থাকবে না আর ----। যাহোক লীলাবতীর ভাইয়েরা অনেক টাকাকড়ি জিনিসপত্তর দিয়ে চতুরার হাতেপায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিলো। সবকিছু সুভালাভালি মিটে গেছে এখন।"

হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়লো। "মা, বাবা যে গোবর্ধনকে বললো নাতি নাতনি দুই-ই পেলে? তার মানে?"

"ওই যে ক'মাস আগে শনিচরির ছেলে হল একটা? সেই ব্যাপারেই তো লীলাবতীর ভাইয়েরা আরও ক্ষেপে আগুন হয়েছিল। তবে শনিচরিকে আমরা যতটা খারাপ ভেবেছিলাম মেয়েটা সেরকম নয়। সে-ই তো লীলাবতীর দেখাশোনা করছে এখন। তাবৎ সংসারের হাল ধরে আছে।"

আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, "আমাদের বাড়ি দেখা টেখা করতে আসবে না তো আবার?"

"কেন বল্ দিকিনি?"

"আমার খুব খারাপ লাগবে। অত কাণ্ডের পর এখন আবার দুই সতীনে গলাগলি করে আহ্লাদ জানাতে যেন না আসে আমার থাকাকালে। ছিঃ, মেয়েমানুষ বলে কি এতটুকু সেলফ্ রেসপেক্ট থাকতে নেই !"

"ঠিক আছে, তোর বাবা গোবর্ধনকে বলে দেবে। দুর্বল শরীরে এখন ওদের কিছুদিন বাড়ির বাইরে না বেরুনোই উচিত। তুই ওই সব আজে বাজে কথা ভেবে ছুটিটা মাটি করিস না তো ! বরং আজ বিকেলে চিত্রাদের বাড়ি ঘুরে আয়। কোলকাতা থেকে অনেক বাংলা রেকর্ড নিয়ে এসেছে চিত্রার মামা ---- ।"